আমাদের সেকালের পুজো

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BANGLADARSHAN.COM

॥আমাদের সেকালের পুজো॥

আমাদের ছেলেবেলায় পুজো আসত। কয়লাহাটার রাজা রমানাথ ঠাকুরের বাড়িতে তখনো পুজো হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে পুজো না থাকলেও পুজোর আবহাওয়া এসে লাগত আমাদের বাড়িতে।

পুজোর আগেই আসত চীনেম্যান—বার্নিশ করা নতুন জুতোর জন্যে পায়ের মাপ নিতে। সব বাড়ির ছেলেরা মিলেই পায়ের মাপ দিতুম। অবাক হতুম তার মাপ নেওয়ার কায়দা দেখে। এক টুকরো লম্বা ফালি কাগজ নিয়ে সব ছেলেদের একবার পায়ের লম্বা আর একবার বেড়টা মেপে নিয়েই ছেড়ে দিত। মাপ নেওয়ার ওই রকম যত্ন দেখে মনে আশঙ্কা হত যে জুতো কোনো দিন এসে পৌঁছবে কি না। কর্তাদের চোখের আড়ালে চীনেম্যানের গা ঘেঁষে জিজ্ঞেস করতুম—জুতো কবে আসবে বলো না। ভালো করে মাপ নিয়েছ তো? ফোস্কা পড়ে না যেন এমন জুতো তৈরি করে দিয়ো। নাকী সুরে চীনে সাহেব বলত, 'ঠিক হোঁবে, বালো জুতো হোঁবে।' চীনেম্যান বলে নাক কুঁচকে ঘেন্নায় অবহেলা করবার জো ছিল না। একবার কে যেন বলেছিল, 'চীনেম্যান চুং চ্যাং, মালাইকা ভট্‌।' তার জন্য তার ভয়ানক বকুনি হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে তার আদর ছিল খুব। সৌম্যমূর্তি চীনেম্যান আর তার হাস্যমুখ এখনো মনে পড়ে।

তারপর আসত দরজি। তার নামটা ভুলে গেছি। যতদূর মনে পড়ে 'আবদুল।' তার মাথায় গোল গম্বুজের মতো একটা মস্ত শাদা টুপি। গায়ে সামনে-বোতাম দেওয়া দিব্যি ধবধবে শাদা চাপকান, মস্ত ভুঁড়ি। পিঠে কাপড়ের পুঁটলি। তার কাছে দিতে হত সক্কলের জামার মাপ। জামা তৈরির কাপড় জোগানের ভারটা সেই নিত। সবুজ কিংখাপের থান, তার ওপর সোনালি বুটি—সেটাই ছিল ছেলেদের সকলের পছন্দ; সেই থান থাকত তার বগলে—সেই কাপড় থেকে ছেলেদের একটা করে চাপকান সক্কলের তৈরি হত। সব ছেলেদের একরকম পোশাক। আর ওই কাপড়েরই জরি দেওয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি টুপিও একটা সকলেই পেতুম। এই হল পুজোর পোশাকের পালা।

BANGLADARSHAN.COM

পোশাকের পালা চুকে গেলে আসত গিব্রেল সাহেব। ইহুদী সাহেব সে। টকটকে রঙ, গোঁফ-দাঁড়িতে জমকালো চেহারা। তার চেহারাটা হুবহু শাইলকের ছবি। তার ওপর ইহুদী—জামার আস্তিনে রুপোর বোতাম সারি সারি লাগানো থাকত। তা দেখে চমক লাগত। সে আসত গোলাপ আর আতর বিক্রি করতে। কর্তারা, বাবুরা, সব্বাই ছিলেন তার খদ্দের। আমাদের ছোটোদের জন্যও ছোটো ছোটো শিশিতে সে আনত গোলাপি আতর। সেটা আমাদের বার্ষিকী। তার জন্যে পয়সা দিতে হত না তাকে।

তার পরেই পুজোর পার্বণীর পালা। ছোটো-বড়োর হিসেবটা তখনই বেশ বোঝা যেত। বড়োরা বেশি পেত, আর ছোটোরা পেত কম। বড়োরা কেউ চার টাকা, কেউ আট টাকা—আর ছোটোরা বয়স হিসেবে এক টাকা থেকে আট আনা চার আনা। এই রকম পার্বণী পেতুম আমরা, চাকর-বাকরদেরই হত জোর লাভের মরশুম। তাদের হাতে আমাদের পাওনা যার যার পার্বণী জমা করে না দিলে নানারকম মুশকিল বাধত। তবে আমার

চাকর রামলাল ওরই মধ্যে একটু লোক ভালো ছিল। সে সর্বৈব ফাঁকি দিত না, ওই পার্বণীর পয়সা থেকে চীনে বাজারে গিয়ে আমার জন্যে এক-আধটা নতুন খেলনা এনে দিত যে তা বেশ মনে আছে। এই রামলাল চাকর ছিল কয়লাহাটার বাড়িতে ছোটো কর্তা রাজা রমানাথ ঠাকুরের পা-টেপার চাকর। ছোটো কর্তা ভারি শৌখিন মানুষ ছিলেন—হাতের স্পর্শ হিসেবে তাঁর সব তেল মাখানোর চাকর, মাথা টেপবার চাকর, পা টেপবার চাকর, এমনি সব রকম রকম চাকর রাখা হত।

ষষ্ঠির আগেই নেমন্তন্ন আসত। ছোটো কর্তার বাড়ির পুজোয় নেমন্তন্ন হত বাড়িসুদ্ধ ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলের। আমাদেরও নেমন্তন্ন রক্ষে করতে ও ছোটো কর্তাকে প্রণাম করতে যেতে হত। সেখানে আবার আর-এক প্রস্থ পার্বণী আদায় হত। তিনিই দিতেন পার্বণী, বড়োদাদাকে (গগনেন্দ্রনাথ) এক টাকা, মেজোদাদাকে (সমরেন্দ্রনাথ) আট আনা আর আমি পেতুম চার আনা। একবার আমি তাঁর সামনেই ঘোরতর বেঁকে বসলুম। ‘চার আনা নেব না, এক টাকা দিতে হবে।’ এ বুদ্ধিটা বোধ হয় রামলালই দিয়েছিল। ছোটো কর্তা সেই বুড়ো পাকা আমটির মতো। এ কথা শুনে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে রুপোর সিকিটি নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—‘এই নাও, না—ও, রাগ কোরো না, একে বলে টাকার ছানা—এ বড়ো হবে।’ আর আমার মুখে জবাব নেই। এর পর কী জবাব দেব রামলাল তো শিখিয়ে দেয় নি। কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে তাই নিলুম। ছোটো কর্তাকে প্রণামের পালা শেষ করে ঢুকতে হত অন্দরে। সেখানে সব আগে দিদিমাকে (রমানাথ ঠাকুরের স্ত্রী) প্রণাম করেই সন্দেশ পেতুম। দিদিমা আবার নতুন করে নেমন্তন্ন দিতেন—‘রামলাল, ছেলেদের যাত্রা দেখাতে আনিস।’

BANGLADARSHAN.COM

নবমীর দিন যাত্রা বসত কয়লাহাটায়। ওই দিন সন্ধে থেকে সেখানে হাজির। খাওয়া-দাওয়া সব সেখানেই। চাকররা আমাদের খাওয়া-দাওয়া সারিয়ে নিয়ে যেত কর্তার একটি ঘরে—সে ঘরে মস্ত একখানা সেকেলে খাট ছিল। সে যেন বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের চেয়েও জমকালো। সেটা এত উঁচু যে সিঁড়ি বেয়ে তাতে উঠতে হত। সেইখানে নিয়ে গিয়ে চাকররা আমাদের শুইয়ে দিত। আর বলে যেত—‘এখন ঘুমোও, যাত্রা জমলে নিয়ে যাব।’ চাকরদের ভয়ে তখন চুপচাপ লক্ষ্মীছেলে হয়ে শুয়ে পড়তুম। মটকা মেরে ঘুমোবার ভান করতুম। তারপর চাকররা চলে গেলে সেই খাটের ওপর আমাদের বাড়ির ছেলেরা আর সে-বাড়ির ছেলেরা সবাই মিলে হৈ-হল্লা, গল্প-গুজব খেলা শুরু করে দিতুম। ঢোল বাঁধা হচ্ছে, গিজতা গিজুম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া ভোজের ‘এটা নিয়ে আয়’ ‘ওটা নিয়ে আয়’ ‘দই আন সন্দেশ আন’ এই-সব কানে আসত। এই করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তুম জানি নে।

যাত্রার আসরে দেখি সব গুরুজনরা সামনে বসেছেন। বড়ো বড়ো সব সটকা পড়েছে। আসর ঘিরে পাড়া-পড়শী চাকর দাসী চেনা অচেনা মেলাই লোক জড়ো হয়েছে। দোতলার বারান্দায় খড়খড়ির পিছনে মেয়েরা, বৈঠকখানার বারান্দায় ছোকরা বাবুরা। আর আমাদের জায়গা ছোটোকর্তার বসবার পিছনে এক দিকে। তিনি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে বসতেন। ছোটোদের বড়ো ভালোবাসতেন তিনি। আরতির সময়ও আমরা তাঁর চারপাশে সামনে পিছনে হাতজোড় করে সারি দিয়ে দাঁড়াতুম।

যাত্রা তখন জমেছে। কত রকম নাটকই না তখন হত। 'বউ মাষ্টার' না কী একটা যাত্রার দলের নাম আমার মনে আছে। চারধারে গেলাস-বাতি জ্বলছে—তাইতেই আসর আলো। মাঝে মাঝে তেলবাতির ফরাস এসে তেলবাতি বদলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হরকরারা সব পান দিয়ে যাচ্ছে। দরোয়ানরা গোঁফ পাকিয়ে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে একেবারে খাড়া, যেন দুগ্‌গা-ঠাকুরের অসুর সব দাঁড়িয়ে উঠেছে। যাত্রার সময় সবাই রুমাল বেঁধে প্যালা দিতেন। আমাদেরও হাতে চাকরেরা রুমালে পয়সা বেঁধে দিয়ে বলত—'বাবুরা যখন প্যালা দেবেন, তখন তোমরাও প্যালা দিয়ো।' রুমাল সুদ্ধ পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ভাবতুম রুমালখানা বুঝি আর ফেরত এল না। কিন্তু অধিকারী মশাই ঠিক আবার রুমাল থেকে টাকাপয়সা খুলে নিয়ে রুমালগুলো একত্র করে যার যার কাছে পৌঁছে দিতেন।

যাত্রায় দেখতুম সব বালকের দল গান গাইতে বেরত। তাদের মাথায় সব পালকের টুপি। সে পালকের বাহার দেখে নাম দেওয়া হয়েছিল 'বক-দেখানো' পালকের টুপি। অধিকারী আসতেন যাত্রার আসরে চাপকান পরে। মাথায় সাম্‌লা চড়িয়ে, বুকে গার্ড-চেন ঝুলিয়ে। জুড়িদের শুধু শাদা কাপড়ের ইজের আর চাপকান। রাজাদের গালপাট্টা—মোড়াশা পাগড়ী—মন্ত্রীরও তাই, খালি যা পাকা গোঁফ। নারদ এখানে যেমন, তখনো তেমন। একরাশ পাটের দাড়ি গোঁফ, ছেঁড়া নামাবলী গায়ে—আর বাঁশের আগায় লাউখোলা বাঁধা কী একটা একতারার মতন নিয়ে দেখা দিতেন। ছেলেরা সব পেশোয়াজ আর নোলক পরে সখী সাজত। মাথায় জরি দিয়ে জড়ানো বিনুনী চুল। বুকে উকিলদের মতো ক'রে ওড়না জড়ানো। তবে কারুর কারুর গোঁফ দাড়ি কামানো হয়ে উঠত না যে তাও দেখেছি।

BANGLADARSHAN.COM

কী যে অভিনয় হত তা সব বুঝতে পারতুম না। তবে বেশ মনে আছে কখনো কখনো চোখে জল এসে যেত। কখনো ভারি ভয় হত। কখনো হাসতুম, অথচ ভয় করত। ভীম, রাবণ, কংস, ওদের হুংকার আর অ্যাকটিং শুনে বুক কেঁপে উঠত। তার ওপর ভীমের গদাটা ছিল ভারি কৌতূহলের জিনিস।—'মোমজমা' কাপড়ের খোলে তুলা ভর্তি করা থাকত যে, তা কি জানতুম। ওইটে ঘুরিয়ে হারে! রে! রে! করে ভীম আসরে প্রবেশ করলেই পিলে চমকে যেত।

এমনি সব দেখতে দেখতেই ভোর হয়ে যেত। ঝাড় আর গেলাস-বাতির সব আলো মিটমিটে হয়ে আসত—দেখতুম কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে—কেউ চোখ বুজে তামাকই টেনে চলেছে। সেই সময় ঢাকা দেওয়া একটা পাখির খাঁচা হাতে হাজির হত এক বহুরূপী। নানা রকম প্রভাতী পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে জানিয়ে দিত—ভোর হয়েছে 'যাত্রা শেষ।' আজকালকার যাত্রা-থিয়েটারের মতো ওই ঠ্যানঠেনে ঘড়িঘণ্টার বিরক্তিকর আওয়াজ ছিল না সেকালের যাত্রায়। যাত্রা শেষ জানিয়ে দেবার জন্যে ঢোলটা একবার বেজে উঠত মাত্র। এদিকে রৌসুনচৌকিতে 'ভোরাই' ধরত। ওই অত ভোরে কিন্তু তখনো অনেক আগন্তুক আসত, বেশির ভাগ মেয়েরাই, গঙ্গা নেয়ে ঠাকুর দেখতে এসে গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে যেত। আমাদের নিয়ে রামলাল তখন বাড়িতে ফিরত। কয়লাহাটার মোড়ে গিয়ে গাড়ি ভাড়া হত। তখন সেখানে গোরুর গাড়ির

ভয়ানক ভীড়। হৈ-চৈ হট্টগোল–গাড়িতে গিয়ে উঠতে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করত। এখন তো সেখানে তোমাদের মস্ত রাস্তা বিবেকানন্দ রোড।

এর পরে বিজয়া। সেইটে ছিল আমাদের খুব আনন্দের দিন। সকাল থেকে খালি কোলাকুলি আর পেন্নাম। আমরা তখন যাকে-তাকে পেন্নাম করছি। সেদিনও কিছু কিছু পার্বণী মিলত। আমাদের বুড়ো বুড়ো কর্মচারী যাঁরা ছিলেন–যোগেশদাদা প্রভৃতিকে আমরা বিজয়ার দিন পেন্নাম করে কোলাকুলি করতুম। বুড়ো বুড়ো চাকররাও সব এসে আমাদের টিপ্ টিপ্ করে পেন্নাম করত। তখন কিন্তু ভারি লজ্জা করত। খুশিও যে হতুম না তা নয়। কর্তামশায়কে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ), কর্তাদিদিমাকে, এ-বাড়ির ও-বাড়ির সকলকেই প্রণাম করতে যেতুম! তিনি জড়িয়ে ধরে বলতেন–'আজ বুঝি বিজয়া! সে কি কম আনন্দ! তাঁর কাছে তো সহজে যাওয়া ঘটত না, তাই। তার পর সন্ধেবলা হল 'বিজয়া সম্মিলনী।' আমাদের বাড়িতেই বসত মস্ত জলসা। বিষ্টু-ওস্তাদ তানপুরা নিয়ে গানে গানে মাত করে দিতেন। তার গলায় বিজয়ার সেই করুণ গান শুনে মেয়েরা চিকের আড়ালে চোখের জল ফেলতেন। কী তাঁর গান–

'আজু মায়ে লয়ে যায় সহে না প্রাণে
যার প্রাণ যায় সেই জানে॥'

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥